জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতা : কিছু অনুষঙ্গ

ডঃ সুশান্ত ঘোষ

কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ ভারত

প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেননা এমন কোনো কবি কি আছেন? সব কবিই তো কম-বেশী প্রকৃতির কবি। তবে কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতিকে বেশি করে পাওয়া যায়। প্রকৃতির বুকে কবির জন্ম এবং প্রকৃতির বুকেই বড়ো হওয়া। তাঁর কবিতায় রয়েছে প্রকৃতির ঘ্রাণ, প্রকৃতির সাথে তাঁর একান্ত প্রেম, নিভৃতি অভিসার। ছোট্ট একটি পাতা কিংবা ফুলও কবিকে শিহরিত করত, ক্ষুদ্র কীটের বুকের ব্যথাও যেন বাজতো তাঁর বুকে তীব্রভাবে। স্বভাবে কবি ছিলেন লাজুক, চুপচাপ, মুখচোরা ও নির্জন। লোকজনের সাথে তেমন একটা কথা বলতেন না। তাঁর সার্বক্ষনিক সম্পর্ক ছিল প্রকৃতির সাথে। নক্ষত্র, জোনাকি, নদীর জল,বাতাসের ঘ্রাণ, গাছের পাতা ,আকাশের নীল, ভোরের শিশির এদের সৌন্দর্য সুধা পান করতেন কবি চোখে ও মনে , এদের সুখ-দুখ অনুভব করতেন একান্তভাবে। প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের সাথে কবির নিবিড় সম্পর্ক। কিভাবে প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ জীবনানন্দের কাব্যে এবং কবির সঙ্গে এক হয়ে উঠে এসেছে তা এখন সূত্রাকারে আলোচনার অপেক্ষা রাখে ---

*** লতাগুল্ম, বৃক্ষরাজি ও কবি ঃ-**

জীবনানন্দ দাশ পৃথিবীর পথে হেঁটেছেন। আকাশের সাথে নক্ষত্রের কথা শুনতে কান পেতেছেন। হেমন্তের পাতাঝরা দেখেছেন। পোড়ো জমি খড়, মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, মেটো চাঁদ এমন কত কি তাঁর দৃষ্টিতে প্রাধান্য পেরেছে। কবি দেখেছেন ঘুঘুদের সাদা ডানা, নীল রাত্রি কমলা রঙের মেঘ সমুদ্রের ফেনা, রোদ হরিণের বুকে বেদনার নীরব আঘাত। সমুদ্রের জলে পা ধুয়েছেন, শীতের নদীর বুকে অস্থির ঢেউ দেখেছেন আর ক্রমশই হারিয়ে গেছেন লতা গুল্ম বৃক্ষরাজির ভুবনে। তাঁর নান্দনিক দৃষ্টি অপরূপের দেখা পেয়েছে বাংলার আকন্দ ধুন্দল অশ্বত্থ বট-নিম- ঝাউ-হিজল-তমালের মাঝে। শীতরাতে কবি আবিষ্কার করেছেন --- আকন্দ ধুন্দুল জোনাকিতে ভরে গেছে , অশ্বত্থের ডালে ডালে ডাকছে বক। হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করছে খেলা। নিবিড় বটের নিচে লাল ফল পড়ে আছে। সুপারির সারি সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ, মৃত্যু আগে কবি আরো দেখেছেন বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা চুপে চুপে নেড়ে কে যেন বিছাতে চায় নীড় তাঁর গাছের মাথার পরে হাঁসের মতন। জীবনানন্দের কাব্যে এসেছে-' জামপাতা ছায়া শালবন, কবি বারবার দেখেছেন তমালের হিজলের অশ্বত্থের শাখা (বৈতরণী)। কবির চোখ ছিল যেখানে বইচির ঝোপে শুধু পাই বাবলার ঝাড় আর জাম হিজলের বন, কোথাও অর্জুন গাছ, সেইখানে দুপুরের জলপিপি যে শব্দ শুনছে, কবিও শুনেছেন বটের পাতার পথ দিয়ে হেঁটে যেতে (নদীর)। শুধু বৈঁচির ঝোপ নয় ,আম , জাম , কাঁঠালের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন কবি বারে বারে বারে। জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে তাঁর একান্ত আভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে—

আমি এই বাংলা পারে র্যে যাব
দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে
দেখিব খয়েরী ডানা শালিকের সন্ধ্যায় হিম
হয়ে আসে – হঠাৎ তাহারে বনের হিজল গাছ
ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে
(তোমার যেখানে সাধ)

বাংলার কলমীলতাটিও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যকে অলংকৃত করেছেন, তালবন নীল তেঁতুলের বন, বইচির বন কদমের জল নিয়ে। আর সুখের ঘর বেঁধেছেন আম-জাম- কাঁঠালের দেশে। কবির প্রত্যাশা বাংলার আমের পাতাতে কাঁচা পোকা ঘুমায়েছে 'আমিও ঘুমায়ে রব

তাহাদের সাথে'। কখনও বট কখনও আম কিংবা কাঁঠালের নীচে গভীর প্রশান্তি নিয়ে পৃথিবীর শেষ ঘুমও ঘুমাতে চেয়েছেন কবি। মৃত্যুর ঘুম ভেঙ্গে আবার ফিরে আসার বাসনাও ব্যক্ত করে গেছেন কবি। সে ফেরা হতে পারে মানুষ রুপে , শঙ্খচিলে বা শালিক কিংবা ভোরের কাক হয়ে এবং যে রুপেই ফেরা হয়না কেন অবশ্যই তা হবে কাঁঠাল ছায়ায়। (আবার আসিব ফিরে)

বাংলার লতাগুল্ম বৃক্ষরাজির বিশাল সমারোহ জীবননান্দ দাশের কবিতায়। অতি সুক্ষ লতাটির মাঝেও যে সৌন্দর্য , প্রকৃতির সাথে তার সে সম্পৃক্ততা তার পুরোটাই নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন কবি ।

* নানা ঋতুর নানা রঙ জীবনানন্দের কাব্যে--------

আমাদের দেশের ছয়টি ঋতুই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আবহে ব্যতিক্রম। গ্রীষ্ম প্রচণ্ড তাপদাহ এবং দমকা ঝড়ো হাওয়ার প্রকৃতি। বর্ষা নিয়ে আসে আকাশভর্তি মেঘ, বৃষ্টির প্রশান্তি এবং সজল- সজীব আবহাওয়া । বর্ষার শেষে শরৎ আসে কিছুটা পরিবর্তিত পরিবেশের মাধ্যমে। এই ঋতুতে আমাদের চারপাশে স্পষ্ট কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। বর্ষার মতো তুমুল বৃষ্টি বাদল হয় না। আবার একেবারে বৃষ্টি শূন্যও থাকে না। দিনে রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি, রাতে জোছনা ও মেঘের খুনসুটিতে শরৎ বেশ উপভোগ্য ঋতু আমাদের। কিন্তু হেমন্তের চেহারা একেবারেই ভিন্ন। ভাবগভীর মনোভাব আর নির্জনতা ঘন স্বভাবে হেমন্ত একদম স্থির, নির্জীব। শীতও কুয়াশাকে সাথে করে তার নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জল। বসন্তও দখিনা হাওয়ার উচ্ছ্বাসে ভরপুর। জীবনানন্দের কাব্যে হেমন্ত ঋতুকেই সবচেয়ে বেশী করে পাওয়া যায়। শীত ও বসন্তও অনেকটা অংশ জুড়ে কবিতায় রয়েছে।

* হেমন্ত:-

নির্জনতা আর উদাসীনতার নিবিড় আবহে হেমন্ত আমাদের প্রকৃতিতে যে বিশিষ্টতার চিহ্ন আরোপ করে দেয় তা অন্য ঋতুগুলোর বেলায় পুরোপুরি মিলেনা। কবিতায় অনেক ভারি ভাব ও বক্তব্যকে যথাযথ-ভাবে বিকশিত করতে জীবনানন্দ বারবার ফিরে গেছেন হেমন্তের প্রকৃতির কাছে। হেমন্তের মাঠ-ঘাট, নদী-জলাশয়, গাছ-গাছালি, লতাপাতা, ফুল, জল, হাওয়া ,ঘাস শিশির সহ অগণিত অনুষঙ্গ ও উপাদান দারুণভাবে সহায়ক' হয়েছে তার বক্তব্য প্রকাশে এবং অর্থবিকাশে। জীবনানন্দ দাশকে 'হেমন্তের কবি'ও বলা হয়ে থাকে। স্মৃতি, ইতিহাস, স্বপ্নভঙ্গ, সমসাময়িক অসঙ্গতি, প্রেম, বিরহসহ সব ধরনের ভাব ও বক্তব্যকে কবিতারূপ দিতে গিয়ে নানা শব্দে, অলংকার সৃষ্টি করতে তিনি হাত বাড়িয়েছেন হেমন্তের প্রকৃতির কাছে। জীবনানন্দ প্রকৃতিকে হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে জানেন বলেই, চিনেন বলেই তাঁর কবিতার শরীর জুড়ে দেশীয় অলংকারের সৌন্দর্য ঝলমল করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎ আর ঋতুরাজ বসন্তের কবি , বর্ষাও তাঁর কাব্যে অবহেলিত নয়। প্রকৃতি তাঁর কাছে পূর্ণরূপে ধরা দিয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যের হেমন্ত একাধারে ফাঁকা মাঠ ও ভরা ক্ষেত, রিক্ততা ও পূর্ণতা, জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক। জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্ত কিভাবে এসেছে, এর কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ---

ঝরা পালক

একদিন খুঁজেছিনু যাবে
বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গ্রাধূলি-আঁধারে

হেমন্তের হিম ঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু ঝরে ঝরে।
কামিনীর ব্যথার শিয়রে,
(একদিন খুলেছিন্তু মারে)

২. ফিরিতেছ বারম্বার একাকী বিচরি।

হেমন্তের হিম পথ ধরি, (আলেয়া)

৩. পাতাঝরা হেমন্তের স্বর

করে দেয় সচকিত তারে. (শশ্মান)

৪. মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা

হেমন্তের বিদায়- কুহেলি, (পিরামিড)

'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই হেমন্ত শীতলতায়, নির্জনতায়, রিক্ততায় বিচ্ছেদে পরিত্যক্ত কালের প্রতীক।

<u>ধূসর পাণ্ডুলিপি</u>

১. যখন ঝরিয়া মাব হেমন্তের ঝড়ে

পথের পাতার পাতা তুমিও তখন

আমার বুকের পরে শুয়ে রবে? (নির্জন স্বাক্ষর)

2. প্রথম ফসল গেছে ঘরে

হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে

শুধু শিশিরের জল (মাঠের গল্প)

৩. আকাঙ্খার আলোড়নে চলিতেছে

হেমন্তের নদী, ঢেউ ক্ষুবিতের মতো এক সুরে (অনেক আকাশ)

৪. মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে-

শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব। (অবসরের গান)

৯. হেমন্ত রাতের আগে ঝরে যায়,- পড়ে যায় নুয়েং- (জীবন)

৮. সমস্ত পৃথিবী ভরে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস। (জীবন)

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য গ্রন্থে হেমন্ত এসেছে কখনো ক্ষয়ের রূপ ধরে আবার হৃদয়ে স্বপ্নও জেগে থাকে। তবে এখানে হেমন্তের দ্বারা 'বিষাদঘন রূপ চিত্রই বেশি এঁকেছেন কবি।

<u>রূপসী বাংলা</u>

১. 'গোলপাতা ছাউলির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়

উড়ে যায়-মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে , (২১ নং)

ঋতুকে দুটি মাসে ভাগ করা হয়। হেমন্ত ঋতুর মাস হল অগ্রহায়ণ ও কার্তিক। তাই এখানে কার্তিক মাস অর্থাৎ ঋতুর হেমন্ত কাথাই উঠে এসেছে। অগ্রহায়ণ মাসকে নিয়ে লেখা-

' আমার দেহের পরে আমার চোখের পরে ধানের আবেশে

ঝরে পড়ে; যখন অঘ্রান রাতে ভরা ক্ষেত হয়ে ফেলুদ' (৪৫)

<u>বনলতা সেন</u>

১. আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি

হয়তা ধানের ছড়ার পাশে
কার্তিকের মাঝে (কুড়ি বছর পর)

২. ‘হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে’

৩. ‘অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বলে

হেমন্ত এসেছে তবুঃ’ (অঘ্রাণ প্রান্তরে)

এই কাব্যগ্রন্থে কখনো নারীর সাথে প্রেমের সম্পর্কে কখনো 'কোনো প্রাণীর গতিপ্রকৃতি বোঝাতে কখনো প্রকৃতির রূপের চিত্রকল্প সৃষ্টিতে হেমন্তের দুয়ারে গিয়েছেন কবি---

মহাপৃথিব

১. ‘তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা

জীবনেও নেইকো অন্যথা,

হেমন্তের সহোদর রয়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন’ (প্রেম অপ্রেমের কবিতা)

নির্জনতার প্রতীকে, একাকীত্বের প্রতীকে হেমন্ত এখানে এসেছে।

সাতটি তারার তিমির

১. 'হেমন্তের বিকেলের সূর্য গ্রোল রাঙা-

চুপে চুপে ডুবে যায়- জ্যোৎস্নায়। (গোধূলি সন্ধির নৃত্য)

২. দেবতারা উত্তেজিত না হয়ে অনায়াসে বলে যায়

হেমন্তের ক্ষেত করে হলুদ ফসল ফলেছিল, (চক্ষুস্থির)

৩. হেমন্তের হলুদ ফসল

ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে (বিভিন্ন কোরাস)

৪. দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে;

যদিও লক্ষলোক পৃথিবীতে আজ

আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে (প্রভাব)

৫. সেইসব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু-

তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক,

হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক। (তিমির হননের গান)

৬.হেমন্তের বাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই। (রাত্রির কোরাস)

এই কাব্যগ্রন্থে দেখা গেছে হেমন্ত কখনো হতাশা, আবার কখনো মৃত্যু চেতনায় প্রতীকী হয়ে কাব্যে স্থান লাভ করেছে। 'বেলা অবেলা কালবেলা' গ্রন্থেও দু-একটি জায়গার হেমন্ত এসেছে বিচ্ছেদ, নৈরাশ্যের প্রতীক হয়ে।

শীত:

হেমন্ত্রের পাশাপাশি শীতকালও জীবনানন্দের নানা কবিতায় উঠে এসেছে। যেমন-

১. কাঁদে বুকে মরা নদী- শীতের কুয়াশা। (সিন্ধু)

'মৃত্যুর আগে' কবিতায় অনেকটা অংশ ঝুড়ে শীত উপস্থিত-----

১. আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়

২. আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো

৩. বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ।

কবি মৃত্যুর আগে শীতকালকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন ও ভালোবেসেছেন। 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'শীতরাত' কবিতায় আবার শীত মৃত্যুর প্রতীক হয়ে এসেছে

এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে;

বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে।

এছাড়াও কিছু কিছু স্থানে বসন্ত ও গ্রীষ্ম এসেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'পরম্পর' কবিতায় বসন্তের দিনে আবার ফিরে আসার আকাঙ্খায় কবি বলেন--

"শীত হেমন্তের শেষে আবার বসন্তের দিন
আবার তো এসে যাবে;
এক কবি, তন্ময় শৌখিন,
আবার তো জন্ম নেবে আমাদের দেশে!

এই কাব্যগ্রন্থের ' কসঙ্গে ' এবং 'পাখিরা' কবিতায় বসন্তের রাতকে ভালবেসে কবির চোখে ঘুম আসছেনা-

১. এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে

ঘুম আর আসে নাকো।

বসন্তের রাতে। (কসঙ্গে)

২. ঘুমে চোখ চায়না জড়াতে

বসন্তের রাতে (পাখিরা)

'অবসরের গান' কবিতায় ঘুমের গানের ভেসে আসার সাথে গ্রীষ্ম ঋতুর প্রসঙ্গ এসেছে—

"গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে"

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'সবিতা' কবিতায় কবি সবিতা নামের নারীটিকে বলছেন তারা মানুষজন্ম পেয়েছেন বসন্তেরই রাতে--

"সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি

মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাত"

এভাবে প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতিরই অঙ্গ বিভিন্ন ঋতুকে নানা রসে, নানা ভাবে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন।

নারী, কবি ও প্রকৃতি

"জীবনানন্দের বহু কবিতায় 'নারী' 'শব্দটির অপরূপ ব্যবহারর প্রত্যক্ষ হয়। যেমন- 'মৃত্যুর আগে' কবিতায়- 'দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল সুরঞ্জনা'' কবিতায় আমরা পড়ি-

'সুরঞ্জনা' আজও তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ।'
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন।'
'মিতভাষণ' কবিতায় আছে
তোমার সৌন্দর্য নারী, অতীতের দানের মতন।'

'নগ্ন নির্জন যত' কবিতায়
'সেই নারীর মতো
ফাল্গুণ আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে'।
'আত্মমাম কবিতায়
'সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে

বলিস তোমারে চাই
বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্র আমি কুয়াশার পাখনায়,

জীবনানন্দের র নারী পৃথিবীর অংশ। জীবনানন্দের র কবিতায় যে নারী চিত্রায়িত সে রহস্যময়ী- যেমন প্রকৃতি, সে নারী কোমল- যেমন নদী, এই নারী অপরূপ যেমন নক্ষএ খচিত আকাশ। এই নারী প্রকৃতির অনুষঙ্গ হয়ে জীবনানন্দেরর কবিতায় বিশিস্টতা লাভ করেছে। নারী প্রকৃতির অঙ্গ হয়েই বিভিন্ন কবিতায় ধরা দিয়েছে-

১.'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল

ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার রাঙা আপেলের মত লাল যারগাল

২. কবি বলছেন দরদিয়া তোমাকে তো সবাই ভুলে যাবে কিন্তু তুমি ----

হয়তো বা বনছায়া লতাগুল্ম পল্লবের তলে

ঘুমায়ে রাহিবে তুমি নীল ৫শব্দে শিশিরের দলে,"

কবি তাঁর প্রিয় নাবীকে এই প্রকৃতির বুকে নক্ষত্রের নীচে খুঁজে পেতে চান--

'তোমারে পাব কি আমি কোলোদি দিন? নক্ষত্রের তলে'।

কবির মৃত্যু আসার আগে পৃথিবীর কন্যা অন্ধকারে নদীর কথা বলে গেছে-----

'পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা করে গেছে---(মৃত্যুর আগে)

'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে দেখা যায়। কেশবতী কন্যা যেন এমেছে আকাশে, কবির মুখের পরে যেন- 'চুলতার ভাসে'। আরেকটি কবিতার দেখা যায় বৃষ্টির জলের সাথে নারীর তুলনা করা হচ্ছে--------

"এই জল ভাল লাগে;- বৃস্টির রূপালি জল কতদিন এসে

---------- আবেগের ভরে

ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চলে গ্রেছে কুমারীর মতো ভালোবেসে " (৪৪ বৃষ্টির জন্ম)

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থেও কবি তার প্রিয়াকে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর সাথে তুলনা করছেন

"ঐ যে ওখানে পায়রা একা ডাকে পামিরের বনে।

মনে হয় তুমি যেন ঐ পাখি (তুমি)

তারপর মৃত্যুর পরেও কবির যখন তাঁর প্রিয়াকে আহবান করছেন, কিরে আসার জন্য, তখন এই প্রকৃতির বুকেই ফিরে আসার জন্য বলছেন-

'ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,

ফিরে এসো প্রান্তরের পথে

আম নিম নিম ঝাউয়ের জগতে

ফিরে এসো। (ফীরে এসো)

এভাবে কবিতার ছত্রে ছত্রে দেখা যায় নারী কবির কাছে দ্বিতীয় প্রকৃতি' যা আরেকটা সত্তা বলা যায়। প্রকৃতির মতই নারির সঙ্গে রয়েছে জন্মের পর থেকে এক মেলবন্ধন সারা জীবন ব্যাপী। নারী, প্রকৃতি ও কবি যেন একই তারে বাঁধা।

জীবনানন্দের হৃদয়ে ও কাব্যে বাংলার স্রোতস্বিন

নদী মাতৃক দেশ হল আমাদের এই বাংলাদেশ। বিশেষ করে আবার কবি জীবনানন্দ যেহেতু আশৈশব থেকে কৈশোর যৌবনকাল পূর্ববাংলার বরিশালে কাটিয়েছিলেন, তাই স্বভাবত কারণে নদী বেষ্টিত পূর্ব বাংলার সাঙ্গে হৃদয়-মনের এক সুগভীর আত্মীয়তার বন্ধনের জন্য নদীর প্রতি তাঁর একটা গভীর প্রেম থাকবে এতাই স্বাভাবিক। তিনি মনে প্রাণে বাঙালি ছিলেন এবং বাংলা প্রকৃতির ভেতরে অন্তন্তের সব ভালোবাসা ছাড়িয়ে দিয়ে সব স্বাদ গন্ধ বর্ণের আস্বাদ নিয়ে আনন্দ ঘন, রসসাগরে আনন্দমন পুরুষ হয়ে থাকতে চেয়েছেন। তাই কবির চোখে নদী যে তাঁর ধীর রুপ লাবণ্য নিয়ে হৃদয়ে একটা দাগ কাটবে এ আর আশ্চর্য কি? জীবনানন্দের বেশ কিছু সংখ্যক কবিতায় নদীর উপস্থিতি ঘটতে দেখা যায় মূলত তাঁর চিএরুপময় কবিতাগুলির চিত্রকল্পের অন্যতম উপাদান হিসেবে। নদীকে আশ্রয় করে তাঁর বিশিষ্ট ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে রুপকাশ্রিত মোড়কে, আবার লক্ষ্য করা যায় কোথাও কোথাও নদীকে বিভিন্ন ভাব ভাবনা ও চেতনার ভেতর দিয়ে প্রতিকে রূপান্তরিত করেছেন। নদী যে কীভাবে তাঁর অন্তরে বিশাল একটা জায়গা করে নিয়েছে তা বোঝা যায় তাঁর

সমস্ত কাব্যপটে। ‘ঝরাপালক' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' সব কাব্যগ্রন্থেই কম বেশী নদী নানান রূপ বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর কবিতায় বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে-

জীবনানন্দের কবিতায়-

'নদীর গোলাপী কেউ কথা বলে (এই পৃথিবীতে আমি)

'নদির জলের গন্ধে ভরে যায় ভিজে স্নিগ্ধ তীর (অন্ধকারে)

শুধু তাই নয়, নদীর জলের গন্ধে কোন এক নবীণা তার মুখখানা নিয়ে আসে। তারপর নদীর সাথে প্রিয়ার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে কবিকে প্রিয়ার উদ্দেশ্যে বলতে শুনা যায়-

‘পৃথিবীতে ম্রিয়মান গোধূলি নামিলে

নদীর নরম মুখ দেখা যাবে

মুখে তার দেহে তার কতো মৃদু রেখা তোমারি মুখের মতো’

(ঘাসের ভিতরে যাই)

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে নদী নারী নক্ষএ ইত্যাদি এমনভাবে সম্পৃক্ত যে এদের ছাড়া পৃথিবীর রূপ বর্ণণা করাই সম্ভব নয়।

কবি দেখিয়েছিলেন ---

পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ

কান্তরের একপাশে সে নদীর জল' (শব)

কবির ভাবনায় -

মানুসের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে

বড়ো বড়ো নগরীর বুক ভরা ব্যথা

ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমুল্য স্পষ্টতা
তবুও নদীর মানে নিগ্ধ শুশুষার জল,'
(মিতভাষণ)

নদীর আয়নাতেই পৃথিবীব প্রকৃত রূপ দর্শন করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ এবং তা বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। কবি দেখেছেন-

'নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে
ভেসে নারকোল বনে কেড়ে নেয়
কোরালীর ঙ্গুণঃ বিকেল বলেছে এই নদীটিকে
শান্ত হতে হবে-- (শিরীষের ডালপালা)

কবির সুন্দর দৃষ্টি নদী খোঁজে পেয়েছে,

'রাই সর্ষের খেত সকালে উজ্জল হলে
দুপুরে বিবর্ণ হয়ে গেল
তারি পাশে নদী'

তখন তার সরল জিজ্ঞাসা------

নদী তুমি কোন কথা কও ?
অশ্বথের ডালপালা তোমার বুকের পরে পড়েছে যে
জামের ছায়ায় তুমি নীল হলে
আরো দূরে চলে যাই
এক পাল মাছ রাঙা নদীর বুকের রামধনু
বকের ডানার সারি শাদা পদ্ম-নিস্তব্ধ
পদ্মের স্বীপ নদীর ভিতরে
মানুষেরা সেই সব দেখে নাই (নদী) (অগ্রন্থিত কবিতা)

মানুষরা না দেখলেও জিবনানন্দ দাশ দেখেছিলেন। নদীকে একেবারে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন কবি, শুনেছেন নদীর নিজের সুর।

নষ্টালজিক আর নান্দনিকতা এই দুটির সংমিশ্রণে জীবনানন্দের কবিতায় নদীর বহুমাত্রিক রূপ। বিচিত্র কাহিনির চিত্র যা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায় ------

রাজ বল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা
পদ্মার রূপ একুশ রত্নের চেয়ে আরো ঢেঢ় আনো গাঢ়
আরো চের প্রাণ তার, বেগ তার
আরো চের জল, জল আরো
নদীর ধারে বাসমতী ধানগুলো

ঝরিছে আবারো' (তবু তাহা ভুল জানি)

নদী প্রেমিক কবি একদিন লিখেছিলেন- ‘যখন মৃত্যুর ঘুম শুয়ে রবো ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে’ (যখন মৃত্যুর ঘুম)

কিন্তু রূপসী বাংলা'র কবি আবার লিখলেন---

পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শশ্মানে দিকে যাব বয়ে,
(যত দিন বেঁচে আছি)

জীবনানন্দ দাশের সপ্নের নদী ধানসিড়ি, জলসিঁড়ি। জলসিঁড়ি নদীর পরে শুয়ে পড়তে চেয়েছেন কবি বাংলার পরিপূর্ণ রূপ দর্শনে------

একদিন জলসিড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিশীর্ণ বটের নিচে শুয়ে রবো, পশমের মতো লালফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে, বাঁকা চাঁদ জেগে রবে- নদীটির জল
বাঙালি মেয়ের মতো বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে ভয়ে-"

জীবনানন্দ দাশ বনহংস হতে চেয়েছেন আর বনহংসীকে নিয়ে নিরালা নীড় রচনা করতে চেয়েছেন জলসিঁড়ি নদীর ধারে-----

আমি যদি বনহংস হতাম
বনহংসী যদি হতে তুমি
কোন এম এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধাড়ে
ধান খেতের কাছে
ছিপ ছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে। কে।' (আমি যদি হতাম)

কবি পাড়াগাঁকে ভালবেসেছেন , দুপ্রহরের রৌদ্রে যেন গন্ধ লেখে আছে স্বপ্নররের। এই পাড়াগাঁর দুপ্রহরেই কবি আবিষ্কার করেছেন-

' জলসিড়ি পাশে ঘাসে
শাখাগুলো নুয়ে আছে বহুদিন
ছন্দহীন বুনো চালতার।' (পাড়াগাঁর দুইপহর)

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ধানসিড়িই জীবনানন্দ দাশের কাবিতায় বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। অভিমানী কবিকে অবশেষে ধানসিঁড়ি নদীর তীরে শুয়ে পড়তে দেখা যায়---

ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি
শুয়েছিলাম পাউষের রাতে -
কোনোদিন আর জাগবো 'না জেনে
কোনদিন জাগবো না আমি-

কোনদিন জাগবো না আর’ (অন্ধকা র)

কিন্তু এখানেই শেষ হয়না। কবি আবারও ফিরে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন ধানসিড়িরই তীরে-

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে-এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল -শালিকের বেশে।'

(আবার আসিব ফিরে)

ধানীসিঁড়িটি নানাভাবে কবিতা রচনার উৎস হয়ে উঠছে তার কাছে। যেমন দেখা যায়-

এসব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা;
চালতার পাতা থেকে টুপ টুপ জোৎস্নায় ঝরেছে শিশির;
কুয়াশায় স্থির হয়েছিল ম্লান ধানসিঁড়ি নদীটির তীর;"

(এ-সব কবিতা আমি)

ধানসিঁড়িটির আরো উপস্থিতি পাওয়া যায়-

মেঘের দুপুর ভাসে সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে ,আথ, ধানসিড়ি নদীটির পাশে
সেখান্তে আকাশে কেউ নেই আর, নেই আর পৃথিবীর ঘাসে। (সিন্ধু সারস)

স্বপ্নের নদী ধানসিড়ির পাশেই সোনালি চিলের 'কান্না শুনে কবি লিখলেন-

'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে ' (হায় চিল)

কবি অন্যত্র লিখেছেন-

যদিও আমার চোখে ডের নদী ছিল একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হলে,
তবুও একটি নদী দেখা বেত শুধু তারপর”

এই একটি নদী হয়তো ধানসিড়ি নদী। আর শঙ্খমালা কবিতায় কবিকে সে খুঁজেছিল তারও স্বীকারোক্তি---

বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুইচোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি কুয়াশার পাখনায়
'সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোকে
জোনাকির দেহ হতে- খুঁজেছি তোমারে সেইখানে-
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে-বেয়ে”

ধানসিড়ি, জলসিড়ি, শিপ্রা, ধলেশ্বরী যে নদী-ই হোকনা কেন জীবনানন্দ দাশের হৃদয়ের নদী তাই এ কথা সত্য ও নদী কবির কাব্য বিশেষগুরুত্ব বহন করে।

নক্ষেত্রের সাথে কবির এক নিগূঢ় সম্পর্ক:-

জীবনানন্দ দাশের ভালবাসার রাত নক্ষেত্রের রাত।নক্ষত্রের পানে চেয়ে কবি রচনা করেছেন অনেক কবিতা। মাথার উপর অসমান নক্ষত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টির গুঞ্জরণ শুনেছেন কবি। তাঁর কবিতায় দেখা যায়-

নক্ষত্রের আলো জ্বেলে পরিষ্কার আকাশের পর এসেছে রাত্রি
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ। (জীবন)

কবি রাতে নক্ষত্রের সাথে হেঁটেছেন খুঁজেছেন প্রেয়সীকে কিন্তু পাননি—

"রাতে রাতে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই;"

আকাশ নক্ষত্রকে কি বলছে, একটি কবিতায় কবি প্রশ্ন করছেন—

'আকাশ কহিছে কোন্ কথা
নক্ষত্রের কানে ?

তারপর কবি সেইখানেই পড়ে থাকতে চান মন-

'যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝরে,'
আর প্রেয়সীকে পেতে চান নক্ষত্রের তলে---
তোমারে পাব কি আমি কোনদিন ?- নক্ষত্রের তলে

কবি শুনেছেন মৃত্যুর জড়তাকে নক্ষত্রের সাথে কথা বলতে - নক্ষত্রের সাথে কথা। যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাত। আর কবি নক্ষত্রের মত হয়ে নক্ষত্রের সাথেই থাকতে চান- নক্ষত্রের মতো রব নক্ষত্রের সাথে !!

কবির মন একদিন এই নক্ষত্রের নীচেই ঘুমিয়েছে

নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন (বোধ)

কবি আরো শুনেছেন – লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কোথা কয় পৃথিবীর প্রান ! নক্ষত্র রাতের উদ্দেশ্যে কবির উক্তি- " নেমে আসে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের গুণে/ সেই রাত্রি, আমি তার চোখে চোখে তার চুল নেব বুনে"। -

একটি কবিতায় দেখা যায় কবি সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে নিয়ে নক্ষত্রের নিচেই বসে আছেন আর কবির প্রিয়াকে আহ্বান করেছেন-

সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া। (১৩৩৩)

কবি নক্ষত্রের পানে যেতে যেতেই পথ ভুলে বার বার এই পৃথিবীর ক্ষেতে জন্মগ্রহণ করে করছেন—

নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথ ভুলে বার বার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল। (পিপাসার গান)

কবির অসুস্থ হৃদয় সুস্থ হয় তখনই যখন-

জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয় (পাখিরা)

রূপসী বাংলায় কবি আবার ঘুমিয়ে পড়তে চান নক্ষত্রেরই রাতে 'ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে' আবার সে ঘুম মৃত্যুর ঘুমও এত পারে "যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে রব অন্ধকার নক্ষত্রের নিচে ' কবির সাথে নক্ষত্রের এমনই সম্পূর্ণ যে কবি যেমন বাংলার বুক ছেড়ে একদিন চলে যাবেন তেমনি আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে নক্ষত্রও ঝরে যাবে

'তোমার বুক ছেড়ে একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুকের ছড়ে চলে যাবে ; যে ইঙ্গিত নক্ষত্রও ঝরে
আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে
ডুবে যায়'

নক্ষত্রের নীচে কবি একাই ঘুমিয়ে পড়েন-

'নক্ষত্রের নীচে আমি ঘুমাই একাকী'।

এভাবে আরো অসংখ্য কবিতায় কবির সাথে নক্ষত্রের সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। কখনো কবি জন্ম নিচ্ছেন নক্ষত্রের তলে কখনো মৃত্যুর পরে যাচ্ছেন নক্ষত্রের সাথে। আবার কখন প্রিয়তমাকে সঙ্গে করে রয়েছেন নক্ষত্রেরই সাথে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই নক্ষত্রের সাথে কবি যেন একে আত্মিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছেন।

এভাবে দেখা যায় প্রকৃতির আরো বিভিন্ন অনুষঙ্গ জীবনানন্দের কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করেছে। যেমন- ভোরের শিশির, ধান ক্ষেত, সবুজ মাঠ, আকাশ,সাগর জল , কুয়াশা, রাতের অন্ধকার, সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি প্রকৃতির কোন কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর কাব্যে। জীবনানন্দের কাব্য পাঠ করলে মনে হয় প্রকৃতির নানা অঙ্গের সাথে কবিও যেন একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছেন। প্রকৃতি থেকে কবি আলাদা নন। তাইতো বুদ্ধদেব বলেছেন- 'জীবনানন্দ প্রকৃত কবি এবং প্রকৃতির কবি।' জীবনানন্দ দাশও বলেন-

'আমি কবি , সেই কবি,-
আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি।
আনমনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙ্গুল- মেঘের পানে'।

প্রকৃতির কবি বলেই আকাশে আঁখি তুলে কবি পালকের ছবি দেখেন, প্রকৃতির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধন বলেই কবি আনমনা হয়ে মেঘের পানেই চেয়ে থাকেন।